মাসুদা সুলতানা রুমী

কিছু সত্য বচন

কিছু সত্য বচন

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ঢাকা
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল: ০১৭১১১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

www.amarboi.org

কিছু সত্য বচন

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশনায় : প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৭১১-১২৮৫৮৬, ০১৫৫২-৩৫৪৫১৯

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : জমা.সানি.-১৪৩০হি:
: জুন'২০০৯ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ: : চতুর্থ প্রকাশ: জমা. আউ.-১৪৩০হি:
জুন'২০১০ইং

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ ও ডিজাইন : প্রফেসর'স কম্পিউটার

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

মুদ্রণ : ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা

বিনিময় মূল্য: ২৮.০০ টাকা মাত্র

PPBN-058
ISBN-984-31-1426-0

Eakti Shatta Bachan: writen by Masuda Sultana Rumi, Published by Professor's Publication, Mogbazar, Dhaka-1217. Price Tk. 28.00 Only.

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তা'য়ালার প্রাপ্য। এবার আমি সহৃদয় পাঠক মহলের নিকট নতুন বই নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। নতুন এই বইটির নাম দিয়েছে 'কিছু সত্য বচন'। সত্য বলা কঠিন এবং অপ্রিয় কাজ। সত্য বলা, সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যই পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মিথ্যার সঙ্গে সত্যের দ্বন্ধ-সংঘাত চলে আসছে এবং মহা প্রলয় পর্যন্ত তা চলবে। বস্তুত পার্থিব জীবন মানে মিথ্যার সঙ্গে লড়াই। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মিথ্যার পক্ষ নিয়ে ময়দানে অবতীর্ন হয়েছে মহা প্রতারক ইবলীস আর মিথ্যার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খলিফা হযরত আদম আলাই হিস্‌সালাম। ইবলীসের হাতিয়ার হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি আর আদমের হাতিয়ার হচ্ছে আল্লাহর পক্ষথেকে প্রেরীত বাণী বা হিদায়াত; যা যুগে যুগে মহামানব নবী রাসূলদের প্রতি মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন- "যখনই তোমাদের নিকট আমার পক্ষথেকে হিদায়াত তথা পথ নির্দেশনা পৌছবে, তখন যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে। তার কোন ভয় নেই, তাকে দুঃখিতও হতো হবে না। (সূরা বাকার, আয়াত-৩৮)

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর পথ নির্দেশ মেনে চলবে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- "তারা হবে নরকবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।" (সূরা বাকার, আয়াত-৩৯)

আজ বিশ্বের সর্বত্রই সত্য মিথ্যার লড়াই চলছে। এখানে সত্যের পক্ষের চেয়ে মিথ্যার পক্ষ প্রবল। কিন্তু সবল আর দূর্বলের বিবেচনা না করে ঈমানদারকে সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। বর্জন আর প্রত্যাখান করতে হবে মিথ্যাকে। তা যতই চটকদার আর চাকচিক্যময় হোক না কেন। সাহস করে বুক বেঁধে সত্যের পক্ষে মাঠে থাকতে হবে। হতে হবে সত্যের সাক্ষী, সত্যের

www.amarboi.org

সেনানী। এটাই কুরআনে মজিদের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাক্ষী হতে অবিচল থাকবে। যদি তা তোমাদের পিতামাতা এবং তোমাদের নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়।" (সূরা নিসা, আয়াত-১৩৫)

কোরআন মজীদের নির্দেশ পালন করার নিমিত্তেই এ অদমের লিখনির কারণ। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই এ জন্যে যে, আমার লেখা অনেকে পছন্দ করেছেন। অনেকে সাহস করে সত্য কথা বলার জন্য এ অদমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাদের ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আমি তাদের নিকট দোয়া প্রার্থী, যাতে ভবিষ্যতেও সত্যের পক্ষে কলম দ্বারা বাতিলের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করতে সক্ষম হই।

পাঠক মহলের নিকট নিবেদন, আমি একজন মানুষ। দীর্ঘদিন বিভ্রান্তির চোরাবালিতে হাবুডুবু খেয়ে অবশেষে মহান আল্লাহর রহমতে মহা সত্যের সন্ধান লাভে ধন্য হয়েছি। কিন্তু কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। আমি নিজেও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নই। পাঠক মহলের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করছি আমার লেখায় কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাকে অথবা প্রকাশকে জানালে পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমি সুহৃদয় পাঠক মহলের নিকট দোয়া চাই।

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক সুভেচ্ছা আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। আল্লাহ হাফেজ।।

মাসুদা সুলতানা রুমী

তাং- ১২. ৫.০৯ইং

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসার মালিক আল্লাহ তা'য়ালা, দরুদ ও সালাম প্রিয় নবীর সঙ্গী-সাথী এবং তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি। সাম্প্রতিককালে যাদের লেখা পাঠক মহলে তুফান সৃষ্টি করতে পেরেছে, তাদের মধ্যে নতুন হিসাবে মাসুদা সুলতানা রুমী পাঠক মহলের নিকট বেশ পরিচিত। তিনি ছোট্ট একটি লেখা নিয়ে পাঠকদের সামনে হাযির হন। লেখাটি একটি পীরকে কেন্দ্র করে। কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও লেখাটির ধার অনেক। পীর সাহেবরা যে ইসলামের নামে মুরীদদেরকে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী করছেন, তা লেখিকার লেখা থেকে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পীরের খানকা থেকে তিনি যেমন রক্ষা পেয়েছেন, তেমনি রক্ষা পেতে পারেন যে কোন মনোযোগি সুশীল সমাজ। আমাদের বিশ্বাস সে লেখাটি বিভ্রান্তি নিরসনের ক্ষেত্রে একটা মাইল ফলক হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মাসুদা সুলতানা রুমীর লেখা স্বচ্ছ, ঝরঝরে এবং সুখপাঠ্য। ছোট ছোট বাক্যে যা লিখেন তা পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়।

ইতিপুর্বে লেখাগুলো ছিল এক একটি বিষয় কেন্দ্রিক ছোট ছোট পুস্তিকা। তবে বর্তমান পুস্তিকাটি একটু ব্যতিক্রম। এখানে ধর্মীয় এবং সামাজিক বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে প্রানবন্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ১০টি প্রবন্ধ নিয়ে লেখাগুলো সংস্কারধর্মী। এখানে একটি লেখা উল্লেখ করার মতো। তা হলো বিয়ের পাত্র। ইচ্ছা করলে অনেক সামাজিক কুসংস্কারও দূর করা যায়। আলোচ্য নিবন্ধটি তার প্রমান।

আমরা লেখিকার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি। আল্লাহ তাঁর কলমে আরোও জোর দিন। তার লেখাগুলো কবুল করুন এবং তাঁর কাঙ্খিত সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করুন। আমিন। চুম্মা আমিন।।

এ এম আমিনুল ইসলাম
২০. ৫.০৯ইং

www.amarboi.org

বিষয় সূচি

১.	ঈদুল আযহার তাৎপর্য	৭
২.	ঈদুল ফিতরের তাৎপয	১০
৩.	নারী নয় পুরুষ নির্যাতন	১২
৪.	আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামী পত্রিকার ভূমিকা	১৮
৫.	আযওয়াজ-সাথী	২২
৬.	গীবত একটা ঘৃণ্য অপরাধ	২৫
৭.	শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনী	২৮
৮.	সন্ত্রাসের নেপথ্য আসলে কারা?	২৯
৯.	বিয়ের পাত্র	৩১
১০.	কিছু সত্য বচন	৩৪

www.amarboi.org

১. ঈদুল আযহার তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের চতুর্থ স্তম্ভ হজ্জ। বিত্তশালী, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ এবং স্বাধীন মুসলিম নর-নারীর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

হজ্জের শাব্দিক অর্থ যিয়ারতের সংকল্প বা বাসনা। ইসলামের পরিভাষায়, ইহরামের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কার পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ, আরাফায় অবস্থান এবং মক্কায় নির্দিষ্ট পবিত্র স্থানসমূহে হাজির হয়ে নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করাই হলো হজ্জ।

হজ্জের ফরযিয়াত তথা অপরিহার্যতা অন্যান্য ইবাদত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তবে মূল উদ্দেশ্য এক, তথা আল্লাহ্‌র খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন, "আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য আছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানে না, আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরওয়া করেন না।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (স) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌছার জন্য যার পাথেয় ও বাহন আছে, সে যদি হজ্জ না করে তাহলে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারাদের মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে।"

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেছেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না তাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করতে ইচ্ছা হয়। তারা মুসলমান নয়; তারা মুসলমান নয়।"

আল্লাহর বাণী এবং রাসূল (স) ও তাঁর খলীফাদের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, হজ্জ কত গুরুত্বপূর্ণ ফরয। আর এ কারণেই হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মু'মিনদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে বলেছেন। যেমন মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য একজন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে মশারির মধ্যে দাখিল হতে হয়। কিছু অংশ মশারির ভিতরে আর কিছু অংশ বাইরে থাকলে যেমন মশার উপদ্রব থেকে বাঁচা যায় না, ঠিক তেমনি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করল না, আমরা আদমশুমারি অনুযায়ী তাদের মুসলমান বললেও প্রকৃত মুসলমান হিসেবে তারা আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারবে না,

www.amarboi.org

কুরআন-হাদীস তার দলিল। আর হযরত ওমর (রা) তো তাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করতেই চেয়েছেন। জিযিয়া কর আরোপ করা হয় কাফিরদের ওপর। রাসূল (স) তাদের মৃত্যুকে বলেন ইহুদী-নাসারাদের মৃত্যু আর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের কাফির বলেই ঘোষণা দিলেন। এরপর হজ্জ না করার পক্ষে আর কী বলার থাকতে পারে?

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বহু ধনী লোক আছে, যারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ইউরোপ-আমেরিকা যায়, লাখ লাখ টাকার শাড়ি-গহনা কেনে, কিন্তু হজ্জ আদায় করার খেয়াল তাদের মনে জাগে না।

মানুষ ভ্রমণ করে প্রধানত দুই কারণে: প্রথমত, বৈষয়িক প্রয়োজন। যেমন- লেখাপড়া, রুজি-রোজগারের জন্য। দ্বিতীয়ত, আনন্দ-ফুর্তি বা বিনোদনের জন্য। এ উভয় প্রকার ভ্রমণেই মানুষের নিজের স্বার্থ এবং ইচ্ছা তাকে ভ্রমণে বের করে। নিজের দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে চলে যায়, কিন্তু হজ্জের জন্য বের হওয়া- সে এক ভিন্ন উদ্দেশ্য, ভিন্ন অনুভূতি।

এ ব্যাপারে নিজস্ব কোনো প্রয়োজন, কোনো লোভ-লালসা কাজ করে না। এ সফর হয় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে, পিছনের পাপ গুনাহ থেকে নিস্কৃতির আশায়। আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও করুণা পাওয়ার আশায়, আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাঁর ফরয আদায় করার জন্য।

এ পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে সে যখন হজ্জে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন থেকে তার স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। বদলে যায় তার জিন্দেগী, শুরু হয় তার আত্মা ও মগজের পরিশুদ্ধি।

পূর্বে করা সমস্ত গুনাহ থেকে সে তাওবা করে। সকলের কাছে ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, হকদারের হক নষ্ট করে থাকলে তা আদায় করে। কারো কাছে ঋণ থাকলে তা শোধ করে। অশ্লীল ও বাজে কথাবার্তা, নির্লজ্জতা, ঝগড়া-ফাসাদ থেকে সে বিরত থাকে। 'হারাম শরীফ' যত নিকটে আসে, তার আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহ্ প্রেমের উদ্দীপনা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার পুরো সফরটাই ইবাদত। অতএব দেখা যায়, অন্যান্য সকল সফর থেকে এ সফর সম্পূর্ণ আলাদা। 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' বলে সে হাজির হয় আল্লাহর ঘরে। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বলে, 'ওগো রব, ক্ষমা কর, দয়া কর। তোমার শক্তি সবচেয়ে বেশি, দয়াও অতুলনীয়। এরপর হজ্জ সমাপন করে হাজী ফেরত আসে একজন পরিশুদ্ধ মানুষ হয়ে, নিষ্পাপ মানুষ হয়ে। কোনো প্রকারের খারাবী তার মধ্যে থাকতে পারে না।

www.amarboi.org

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য, প্রতি বছর আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষ হজ্জ করে আসে, অথচ কেন আমাদের সমাজের, আমাদের জাতির পরিবর্তন হয় না? তিন বার হজ্জ করার পরও হাজীর ভেতর থেকে অসৎ স্বভাব, বদ মেজাজি, অশালীন ব্যবহার দূর হয় না কেন? হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হাজীদের মানসিক ও নৈতিক কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। কারণ এখন আমাদের ইবাদত হয়ে গেছে অনুষ্ঠানসর্বস্ব। নামায-রোযাই হোক, আর হজ্জ-যাকাতই হোক, এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, কিন্তু যারা এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝতে চায় না, এর উপকার ও কল্যাণ লাভ করার কথা ভাবে না, শুধু ইবাদতের বাহ্যিক রূপ ঠিক রেখে পূর্ববর্তী লোকদের দেখাদেখি ইবাদতের অনুকরণ করে, তাদের অবস্থা তো 'যদিও ঈসার গাধা যায় মক্কাভূমি, সেথাও থাকবে গাধা জেনে রাখ তুমি'- এর মতো। সমস্ত ইবাদতের মূল লক্ষ্য দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি। যে কথা প্রতি ওয়াক্ত নামাযে হাত তুলে আল্লাহকে বলি, 'রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও .. .. .. ।'

এ লক্ষ্য হাসিলে মূল প্রতিবন্ধক হলো আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের মূর্খতা। আমরা কুরআন থেকে বহু দূরে সরে গেছি। তাই তো নামায পড়ে আমরা নামাযী হই, হজ্জ করে হাজী হই, কিন্তু পূর্ণ মুসলমান হই না। আগেই বলেছি, আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোর আসল উদ্দেশ্য হলো আশরাফুল মাখলুক হওয়ার, আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার প্রশিক্ষণ নেওয়া। আর হজ্জ হলো সবচেয়ে বেশি শ্রম দিয়ে, আর্থিক কুরবানী দিয়ে, সময় দিয়ে করা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ। এ কথা বোঝাতেই ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা (র) বলেন, "হজ্জ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, ইসলামের ইবাদাতসমূহের মধ্যে কোন্‌টি সর্বোত্তম।" হজ্জ করার পর হজ্জের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিলেন, "হজ্জই সর্বোত্তম ইবাদাত।"

সর্বোত্তম ইবাদত মানে সর্বোত্তম দায়িত্ব, সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ। সে কাজের প্রশিক্ষণ, যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন। "ইন্নী জা'য়িলুন ফিল আরদি খালীফাহ্" অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি... ।। খলীফা তাকেই বলে, যে অন্য কারো মালিকানায় তারই দেওয়া ক্ষমতা চর্চা করে। তার মর্যাদা হলো প্রতিনিধির। সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না। এ অবস্থায় সে যদি নিজে মালিক হওয়ার দাবি করে এবং মালিকের দেওয়া ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারী হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে, কিংবা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে 'মালিক' মনে করে তারই হুকুমের অনুসরণ করে, তবে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা, সীমালংঘন, যাতে খলীফা সীমালংঘন না করে (যার আশঙ্কা ফেরেশতারা করেছিলেন) তার জন্যই এসব

www.amarboi.org

প্রশিক্ষণ, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত। পোলট্রি ফার্ম, মৎসচাষ প্রভৃতির ট্রেনিং নিয়ে ঘরে বসে থাকলে যেমন কোনো উপকার হয় না, তেমনি সর্বোত্তম ইবাদত সর্বোত্তম ট্রেনিং হজ্জ করে আসার পর হাজীরা যদি হাত পা তুলে বসে থাকেন, খলীফার দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে আমাদের সমুদয় ফযীলত, ফায়দা, সওয়াব বিফলে যাবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার স্পষ্ট ঘোষণা-

"সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সেসব লোক ছাড়া, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, ঈমানের আলোকে ভালো কাজ করেছে, মানুষকে হকের দাওয়াত বা উপদেশ দিয়েছে (এ কাজ করতে গেলে যে বিপদ মুসিবত আসবে তার জন্য) নিজে ধৈর্য ধারণ করেছে এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আসর : ১-৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

০০০০০

২. ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য

বর্ষ পরিক্রমায় রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের পয়গাম নিয়ে আসে মাহে রমযান। সারা বছর বান্দা যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি করে ফেলে, এ রমযানে তার পরিশোধন হয়।

ভুল-ভ্রান্তি থেকে কে পরিশোধিত হলো, কে নিষ্পাপ হলো, কার রোযা কবুল হলো- এ ঘোষণা হয় ঈদের দিনে।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখে, আল্লাহ্ তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেন।"

আরেক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে রমযান মাসে নামায পড়ে, তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"

রোযা, তারাবীহ ও কদরের পরেই আসে ঈদ। তাই ঈদে এ তিনটি ক্ষমার ঘোষণা এক সাথে পাওয়া যায়।

ঈদের রাত ইবাদতের রাত। ঈদের রাতের ফযীলত অপরিসীম। হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় দুই ঈদের রাত জেগে ইবাদত করবে, যেদিন সকলের অন্তর মরে যাবে, সেদিন তার অন্তর মরবে না।" আরো বলা হয়েছে, "রমযানের ইফতারের সময় প্রতিদিন আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক হাজার

www.amarboi.org

লোককে পরিত্রাণ দেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত ছিল। তবে রমযান মাসের শেষে (ঈদের দিন) যখন আসে, আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন রমযানের প্রথম থেকে ওই দিন পর্যন্ত যত মানুষকে ক্ষমা করেন, তৎসমান পাপীকে ক্ষমা করে দেন।" (বায়হাকী)

অতএব ঈদের দিন বা রাত শুধু রং-তামাশা বা বিধর্মীদের মতো অহেতুক আনন্দ-অনুষ্ঠান নয়। ভালো পোশাক, ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা উত্তম। তবে তা যেন হয় সবার জন্য; এদিকেও নজর দিতে হবে। তাই তো এ ঈদে সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রোযাদার ব্যক্তি নিজের রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে বিশুদ্ধ করে। তাই একে 'যাকাতুল ফিতর'ও বলে। ইবনে কুতাইবার মতে, সাদাকাতুল ফিতর অর্থ হচ্ছে, সাদাকাতুন নুফুস। অর্থাৎ, আত্মার যাকাত। ময়লা দূর করার জন্য যেমন পানি দিয়ে গোসল দরকার, তেমনি রোযার ত্রুটি দূর করার জন্য যাকাতুল ফিতর দরকার।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস হলো, "রাসূলুল্লাহ (স) যাকাতুল ফিতরকে রোযাদারের বেহুদা কথা এবং কাজ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করা এবং নিঃস্ব-অসহায় মিসকিনের খাবার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের আগে তা আদায় করে, আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে। আর যে ব্যক্তি তা ঈদের নামাযের পর আদায় করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-সদকার মতো বিবেচিত হবে।" (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

কতিপয় আলেম বলেছেন, যাকাতুল ফিতর সাহূ সাজদার মতো। সাহূ সাজদার মাধ্যমে যেমন নামাযের ত্রুটি শুধরে যায়, তেমনি যাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে রোযার ত্রুটিও সেরে যায়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "আজ তাদের ধনী করে দাও।" অর্থাৎ ঈদের আনন্দে গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের শামিল করার জন্যই এ ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব।

"তোমাদের রোযা আসমান ও জমিনে ঝুলতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা তার যাকাত আদায় করবে।"

মানুষ পাশাপাশি বাস করতে গিয়ে পরস্পরের সাথে অনাকাঙ্খিতভাবেই মাঝে মাঝে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, মনোমালিন্য হয়, প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ সবই ঈদের দিন ধুয়ে-মুছে যাবে পরস্পরে সালাম, মোসাফাহা ও হৃদ্যতাপূর্ণ কথা বিনিময় এবং খোঁজ-খবর নেওয়ার মাধ্যমে। আর এ সব কিছুই হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত।

www.amarboi.org

পুরো এক মাসের সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে যে আত্মশুদ্ধি, সংযম ও তাকওয়া বান্দার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তার বহিঃপ্রকাশ হতে থাকবে ঈদের দিন থেকে শুরু করে পুরো এগারোটা মাস। আর তা না হয়ে দেখা যায়, সব আত্মশুদ্ধি, সব সংযম, সব তাকওয়া ওই ঈদের দিনেই নিঃশেষ হয়ে যায় বিভিন্ন নাফরমানীমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। ঈদের কেনাকাটা, ঈদের সাজসজ্জা, ঈদের ভোগ-বিলাস এবং গরীব-মিসকীনের সাথে ব্যবহার দেখে মনে হয় না, বান্দার মধ্যে সামান্যতম তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহ্বান!, আসুন, একটু খুঁজে দেখি কী উদ্দেশ্যে রোযা ফরয করা হয়েছিল? ঈদুল ফিতরের আনন্দটা কিসের আনন্দ? কুরআনের গুরুত্ব না দিয়ে রোযার গুরুত্ব না দিয়ে হিন্দুদের পূজা-পার্বণের মতো এই যে বেপরোয়া ঈদের আনন্দ, এর চেয়ে বড় উপহাস আর কী?

θθθθθ

৩. নারী নয় পুরুষ নির্যাতন

দিলদার ভাই লিখতে বলেছিলেন নারীবিষয়ক লেখা। যেমন নারী নির্যাতন, নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি, নারী শিক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু হচ্ছে না। কয়েকবার চেষ্টা করেও সেই একই ফল হলো। আমার লেখাগুরো কেন জানি পুরুষদের পক্ষে চলে যাচ্ছে।

একি স্বজনপ্রীতি? হয়তো তা-ই। আমার স্বজনদের মধ্যে নারীর চেয়ে পুরুষই বেশি। নারীদের মধ্যে আমার মা ও বোনেরা, আর সবাই তো আমার পুরুষ স্বজন। আমার প্রিয়তম আব্বা পুরুষ। প্রিয়তম ভাই দুটি পুরুষ, প্রিয় শ্রেষ্ঠ জীবনসাথী পুরুষ। প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান চারটি পুরুষ। আর সুপ্রিয় বন্ধুটিও পুরুষ। আর তাই বুঝি আমার স্নেহ, প্রেম-ভক্তি, ভালোবাসা, এক কথায় পক্ষপাতিত্ব পুরুষের দিকেই। অনেকেই রুষ্ট কণ্ঠে আমাকে বলেন, "আপনি কি অত্যাচারী পুরুষ চোখে দেখেন নি, কিংবা কানেও কি শুনেন নি তাদের কথা?"

হ্যাঁ, দেখেছি। তাই বলে অত্যাচারী মহিলাও কম দেখি নি। আসুন নারী নির্যাতনটাই একটু খতিয়ে দেখি। আমাদের সমাজে তথাকথিত স্বামীরা স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন করে পিছনে, কিন্তু এক অথবা একাধিক নারীই নির্যাতনের ইন্ধন জোগায়। শাশুড়ি বউকে, কোথাও বউ শাশুড়িকে, কোথাও ননদ ভাবীকে, কোথাও ভাবী ননদকে নির্যাতন করে। এর মধ্যে পুরুষ আছে হাতিয়ার স্বরূপ। যে ব্যবহার করতে পারে, সে বিজয়ী।

www.amarboi.org

নারী নির্যাতিতা হলে সে বিচার পায়। আর কিছু না পেলেও সহমর্মিতা পায়, কিন্তু পুরুষ নির্যাতন বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার। সে বেচারা কারো কাছে বলতেও পারে না। না মা-বাবার কাছে, না বন্ধু-বান্ধবের কাছে, না পারে আদালতে যেতে।

আমার কাছেরই একটা ঘটনা: স্বামী-স্ত্রী কী নিয়ে কথা কাটাকাটি, তর্কাতর্কি। এক পর্যায়ে স্বামী ভদ্রলোক স্ত্রীকে এক ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে উদ্যত হলো। স্ত্রী তাকে পেছন থেকে জামার কলার ধরে টান মেরে ফেলে দিল। তারপর দিল দুই ঘুষি। স্বামী তো হতভম্ব! কী ব্যাপার, পাগল হয়ে গেলে নাকি? স্ত্রী এবার আরো ফুঁসে ওঠলো। পাগল-টাগলের দেখেছ কি? এই বলে সে আরো কয়েকটা লাগাল, তার পর বেহুঁশ হয়ে গেল। ছেলে-মেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করল। আশপাশের লোকজন দৌড়ে এল। সবাই জানল, জামান সাহেব মেরে স্ত্রীকে বেহুঁশ করে ফেলেছে। জামান সাহেবের বড় ছেলে একবার বলতে যাচ্ছিল, না, আম্মু আব্বুকে .. ..। জামান সাহেব ছেলের মুখ চেপে ধরলেন। কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। দৌড়ে গেলেন ডাক্তার আনতে। ডাক্তার এল ৫০০ টাকা ভিজিট দিলেন। মহিলারও হুঁশ হলো। কিছুক্ষণ আগের ঘটনা মহিলার নাকি কিছুই মনে নেই। এমন প্রায়ই হতে লাগল। এক বন্ধুর কাছে দুঃখের এমন কথা বলতেই বন্ধু মুখে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ চুপ। জাত মান সব গেল। জামান সাহেব চুপ। এমনি আরো বহু ধরনের নির্যাতন আছে, যা পুরুষকে চুপ করে সহ্য করতে হয়। কোথাও নালিশ করার জায়গা নেই।

তারপর আসে নারী স্বাধীনতার কথা। হায় আল্লাহ, নারী কি পরাধীন, কার কাছে? কোনো বিদেশি শক্তির কাছে? নারী যদি পরাধীন হয়েই থাকে তবে সে তো নিজের দেহ কাঠামোর কাছে। নিজের সৌন্দর্যের কাছে। নিজের অপারগতার কাছে। এর জন্য সে কাকে দায়ী করবে? কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে? সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে?

বরং আমি তো দেখি, নারীকে আল্লাহ্ তা'আলা কী সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়েছেন। তার ভালো-মন্দ, খাওয়া-পরা, অসুখ-বিসুখ, চিকিৎসা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সন্তানদের ব্যয়ভার সব পুরুষের কাঁধে তুলে দিয়ে নারীকে দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। শুধু কি তাই, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে টাকা রোজগার করার পর সেই টাকা যথেচ্ছ খরচ করার অধিকার কি পুরুষের আছে? না, মোটেও নেই। সে যদি স্ত্রীর খুশিমতো না চলে, না বলে, না খরচ করে, তবে সামাজিকভাবে তো হেনস্তা হবেই, বলা যায় না, যে কোনো সময় হাজতবাসও হয়ে যেতে পারে। অথচ মহিলাদের এমন কোনো সম্ভাবনা তো নেই।

www.amarboi.org

হ্যাঁ, নারী শিক্ষার ব্যাপারটা বলা যেতে পারে। এটা খুব প্রয়োজন। তবে এও সত্য, অদূর ভবিষ্যতে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই শিক্ষা-যোগ্যতা আর কর্মদক্ষতায় অগ্রগামী হয়ে যাবে। তখন কিন্তু আর নারীদের নাগাল পাওয়াই দায় হয়ে যাবে। তাই শিক্ষা শুধু নারীদের নয়; শিক্ষা পুরুষের প্রয়োজন আরো বেশি। পুরুষ কর্তৃক নারীরা যেখানে যেটুকু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তা এ অশিক্ষার জন্যই। আমাদের সমাজে কিছু কিছু জাহেল পুরুষ বিয়ে করেই বিধর্মীদের মতো নিজেকে স্ত্রীর প্রভু বা দেবতা মনে করে বসে। আর নববিবাহিতা বধূটিকে মনে করে তার কৃতদাসী। ইসলামের শিক্ষা কিন্তু এ নয়। কুরআন মজীদে কোথাও পুরুষকে স্বামী বলা হয়নি। স্বামীর আরবী রব। এ শব্দটা একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। আর বিয়ের পর যে সম্পর্কটা হয় তার নাম 'আযওয়াজ', যার বাংলা করলে হয় জোড়া বা সাথী, ইংরেজিতে বলে হাজবেন্ড। স্বামী বা প্রভু শব্দের ইংরেজি হচ্ছে লর্ড। অতএব এ শিক্ষা আমাদের পুরুষদের হওয়া উচিত। তারা স্বামী নন, লর্ড নন, রব নন; তারা নারীর সাথী। তাকে বর বলা যেতে পারে। রব বলা যেতে পারে না।

পুরুষকে এ শিক্ষা নিতে হবে- "সমাজে ওই পুরুষ উত্তম- যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে উত্তম।" (তিরমিযী)

"ওই খাদ্যটুকু সর্বোত্তম সদকা, যেটুকু স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া হয়।" (বুখারী)

নারী-পুরুষ পরস্পরের পোশাক সমতুল্য। মা'র পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত। মায়ের অধিকার বাবার চেয়ে তিন গুণ বেশি। আর নারীকে নিতে হবে এ শিক্ষা- "যদি কোনো নারী সারা দিন রোযা রাখে, আর সারা রাত নামায পড়ে, অথচ তার জোড়া বা সাথী তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার কোনো ইবাদত আল্লাহর কাছে পৌছবে না।" আরো শিক্ষা নিতে হবে এ হাদীস থেকে- "নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, নিজের সতীত্বও হিফাযত করে এবং স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে ঐ নারী আল্লাহর জান্নাতের যে দরজা চাইবে সে দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে।" এ হাদীসে জান্নাত পাওয়ার জন্য নামায রোযার পাশাপাশি স্বামীর আনুগত্যকেও শর্ত করা হয়েছে।

এ আয়াত থেকেও শিক্ষা নিতে হবে-

"পুরুষগণ হচ্ছেন নারীদের উপর শাসক।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

"নারীদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

"জোড়া এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে; যেন তোমরা পরস্পরের নিকট শান্তি পাও।"

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

"ঈমানদার নারী-পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। ওরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।"

এ মুমিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে-

"তাদের এমন বাগবাগিচা দান করবেন, যার নীচ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এ চির সবুজ-শ্যামল বাগিচায় তাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা তাওবা: ৭২)

অতএব আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষা নয়, যে শিক্ষা আমাদের নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বানায়। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষা, যে শিক্ষা আমাদের পরস্পরকে বন্ধু বানাবে, সাথী বানাবে, সহযোগী বানাবে। দুনিয়ার শান্তি আর আখিরাতের মুক্তি তখনই বুঝে আসবে। নারী-পুরুষ আমরা তো আর ভিন্ন ভিন্ন গাছে জন্ম নেইনি। কিংবা পুরুষের গর্ভে পুরুষ আর নারীর গর্ভে নারীও জন্ম নেয়নি। একই মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছি।

আমাদের সমাজে বহুল আলোচিত ঘটনা, নারী নির্যাতন। পত্রিকা খুললেই নির্যাতনের খবর। ঘরে ঘরে নারী নির্যাতন। শারীরিক, মানসিক বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চলে নারীর ওপর। একটু খুঁজে দেখা দরকার, এ নির্যাতন করে কারা? যে কেউ আমার এ প্রশ্ন শুনে বলবে, কারা মানে? পুরুষরা। আমি এ উত্তরের সাথে একমত নই। কারণ, এ ঢালাও অভিযোগ কখনো ঠিক নয়। পুরুষ এককভাবে নারী নির্যাতন করে না; নারী নির্যাতনে নারীর সম্পৃক্ততাই প্রধান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন নারীরাই করে; পুরুষ সহযোগিতা করে মাত্র। আমাদের সমাজ কখনো দুভাগে ভাগ হয়ে যায় নি। অথচ যখনই নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ আসে তখনই মনে হয়, সমাজ বুঝি দু'শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। নারী এক পক্ষ, পুরুষ আরেক পক্ষ। কিন্তু সত্যি কি তাই? কক্ষনো নয়।

আমার বাসায় কাজ করে বয়স্ক এক মহিলা। দুদিন সে আসেনি। অসুস্থ হলো কি না, খোঁজ নেওয়ার জন্য আমি ওর বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি, মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। বললাম, কী হয়েছে তোমার? আমাকে দেখে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠল। দেখেন আপা, আমারে মাইর‍্যা ধইর‍্যা কী করছে? এই বলে পিঠের কাপড় তুলে দেখাল। আসলেই খুব মেরেছে। পিঠে কালো কালো দাগ হয়ে আছে।
- কে মেরেছে? তোমার স্বামী?

www.amarboi.org

- হয় আপা, আর কে মারবে?

কী ব্যাপার? পথে আসতে শুনলাম, তোমার ছেলেও নাকি তার বউকে মেরেছে? দুই বাপ-বেটা কি যুক্তি করে মারল? বুয়া চিৎকার করে উঠল। ও আপারে আমার বেটার মতো ভালো মানুষ আপনে দুনিয়াতে খুঁজে পাবেন না। ওই বউ মার খাইছে ওর মুখের দোষত।

আমি ওর ছেলে বউ'র ঘরে গেলাম। বউটা চুপচাপ বসে আছে। অল্প বয়স। মুখটা মলিন। দরদ দিয়ে বললাম, তোকেও মেরেছে? তা তোর শাশুড়ি বুড়ো মানুষ, ওনাকে মারল কেন? ওরা বাপ-বেটা আসলে ভালো মানুষ না। মেয়েটা প্রতিবাদ করে উঠল। না খালাম্মা, আপনি জানেন না, আমার শ্বশুর খুবই ভালো লোক। আমার শাশুড়ি মার খেয়েছে তার মুখের দোষে। হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, তাহলে তোদের শাশুড়ি-বউ দুজনেরই তো মুখে দোষ হয়েছে। মার তো খাওয়াই লাগবে। প্রতিবেশীরা জানাল, এ দুই মেয়েকে কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না। এদের কথাবার্তা এতই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাচ্ছিল যে, শেষ পর্যন্ত না মেরে উপায় ছিল না।

এ দুটো নারী সাক্ষ্য দিল, পুরুষরা তাদের মারল এর জন্য পুরুষরা দায়ী নয়। দায়ী তারা নিজেরাই। অনেক ক্ষেত্রে তা-ই হয়। পুরুষরা যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর নির্যাতন করে। সেই নির্যাতনেও দেখবেন নারীর অগ্রণী ভূমিকা। পুরুষ তো আসমান থেকে নাযিল হয়নি, কিংবা পাতাল ফুঁড়েও আসেনি। নারীর গর্ভেই তো জন্ম নিয়েছে। সে তো নারীরই কলিজার টুকরা। সেই কলিজার টুকরোর জন্য বউ আনার পর শাশুড়ি, খালা শাশুড়ি, ফুফু শাশুড়ি, চাচী শাশুড়িরাই কিন্তু প্রথম যৌতুকের কথা তোলে। কী ব্যাপার, ছেলেকে কিছুই দেয়নি। এত ভালো ছেলে খালি হাতে বিদায় করল! ডিমান্ড নাই বা দিল, ভদ্রতা বলে একটা কথা তো আছে? না না, এটা ঠিক হলো না। এ ছেলেকে অন্য কোথাও বিয়ে করালে নির্ঘাত ২/৩ লাখ টাকা পাওয়া যেত। এ কথাগুলো বিভিন্নভাবে আলোচনা হতে থাকে। এরপর বর মহোদয়েরও মনে হয়, তাই তো? আমাকে ঠকানো হয়েছে। অতএব .. .. ।

নির্যাতন শুধু যৌতুকের কারণেই নয়। পরকীয়া প্রেমের কারণেও নারীর ওপর নির্যাতন হয়, কিন্তু এর সঙ্গেও কি সে নারীই জড়িত নয়? আমি বলছি না যে, পুরুষের কোনো দোষ নেই। পুরুষের তো দোষ আছেই, কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে পুরুষকে জেলে ঢুকিয়ে কিংবা গালাগাল করে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করলেই পুরুষের সেই দোষ দূর হয়ে যাবে না। পুরুষের দোষ দূর করতে হলে নারীকে সচেতন হতে হবে।

www.amarboi.org

পুরুষের প্রতিপক্ষ হওয়া যাবে না। পুরুষকে কখনো শত্রু ভাবা যাবে না। কারণ, নারী কি পারবে, পুরুষমুক্ত জীবন যাপন করতে? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "মু'মিন নারী মু'মিন পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী .. .. ।" বন্ধু ও সহযোগীর ওপর তো নির্যাতন করা যায় না। এ নির্যাতনের একমাত্র কারণ ইসলাম থেকে, ইসলামী শিক্ষা থেকে সরে গেছি আমরা লাখ লাখ যোজন দূরে। শিক্ষার মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে, আমরা বন্ধু ও সহযোগী। কবির ভাষায়-

"প্রীতি-প্রেমের পুণ্য বাঁধনে
যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখনি
আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।"

মোট কথা, নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে নারীকে ভালো হতে হবে। প্রাচীনকাল থেকে শোনা যায়, শাশুড়ির নির্যাতনের কথা। শ্বশুরের নির্যাতন বলতে কি কোনো কথা আছে? বরং দেখা যায়, শ্বশুরের সাথে পুত্রবধূর খুবই ভালো সম্পর্ক। জীবন্ত নাগিনীর মতো ননদিনীর কথা শোনা যায়, কিন্তু জীবন্ত নাগের মতো দেবর-ভাসুরের কথা কি কেউ শুনেছে কোথাও? বর্তমানে অবশ্য ব্যাপারটা উল্টে গেছে। এখন আর শাশুড়ি-ননদরা নির্যাতন তেমন একটা করতে পারে না। পুত্রবধূরাই এখন বৃদ্ধা শাশুড়িদের ওপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে। ননদ তো রীতিমতো তার কাজের মেয়ে হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মেয়ে জামাইর বাড়িতে শাশুড়ি বেশ সম্মান পায়। শালীর ভাইয়ের চেয়ে দুলাভাইর কাছে কদর পায় বেশি। কারণ সমাজে পুরুষের ওপর নারীদের প্রচন্ড প্রভাব। বলতে গেলে নারীরা পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ করে। ছেলেরা যদি তাদের স্ত্রীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আর মা যদি ছেলেকে শাসন করে, কিংবা বোন যদি ভাবীর পক্ষ নিয়ে ভাইকে জব্দ করে, তখন নির্যাতন আসার পথই তো পায় না।

তাই নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে নারীকেই অগ্রণী হতে হবে। নারীকে হতে হবে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভমুক্ত, পাপচিন্তামুক্ত, প্রেম-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ নির্মল মনের অধিকারী। হতে হবে ঈমানী বলে বলীয়ান। সর্বোপরি হতে হবে আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীরু।

পুরুষের সঙ্গে শত্রুতা করে, পুরুষ বর্জন করে তো আমার চলবে না। কারণ, পুরুষ আমার পিতা, পুত্র, সাথী, ভ্রাতা, স্বামী। কবি কাজী নজরুল বলেছেন-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি
চির কল্যাণকর

www.amarboi.org

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী
অর্ধেক তার নর।"

অতএব সম্মানিত নারীগণ আসুন, আমরা স্বনির্যাতন বন্ধ করি। পুরুষের সমান অধিকার নয়, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষের চেয়ে তিন গুণ বেশি মর্যাদা আমাদের দিয়েছেন। আমরা সে মর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করি। আমাদের স্লোগান হোক-

আমি কন্যা পুরুষের, ভগ্নি পুরুষের, পুরুষেরই মা,
আমি বন্ধু পুরুষের, সহযোগী পুরুষের, পুরুষের প্রিয়তমা।
নির্যাতন নয়, অবহেলা নয়, নয় কোনো অপমান।
এক গৃহে নারী-পুরুষ আমরা গাই জীবনের গান।
সন্ত্রাসী যারা, অত্যাচারী যারা, তারা পুরুষ নয় শয়তান।
নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝে যেন শান্তি থাকে
সমভাবে বিরাজমান।

θθθθθ

৪. আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামী পত্রিকার ভূমিকা

আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামী পত্রিকার ভূমিকা কতখানি, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে, আদর্শ সমাজ কাকে বলে?

আদর্শ শব্দের অর্থ যা অনুসরণ করার যোগ্য। ইংরেজিতে যাকে বলে মডেল। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি বা বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী লোকের বিভিন্ন ধরনের মডেল বা আদর্শ থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামী পত্রিকা যে আদর্শের মুখপত্র, সে আদর্শ হতে হবে ইসলামী আদর্শ। যে আদর্শের প্রবর্তক কোনো মানুষ নয়; স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন। যে আদর্শের আদর্শ বা মডেল হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন-

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে এক সর্বোত্তম আদর্শ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি কর আল্লাহকে স্মরণ করে।" (সূরা আহযাব, আয়াত-২১)

www.amarboi.org

হত্যা, সন্ত্রাস, রাহাজানি, লুটতরাজ, নারী হত্যা, শিশু হত্যা, ব্যভিচার, ক্রীতদাস-দাসী প্রথা- এক কথায় জাহিলিয়াতের কলঙ্ক কালিমায় পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন একটি সমাজকে রাসূল (স) কেমন পুণ্যের আলোয় আলোকিত করলেন। তাঁর ভাষায় তাঁর কাঙ্খিত সমাজের রূপ হলো, "তোমরা দেখে নিও, হাজরা-মাউত থেকে সানা পর্বত পর্যন্ত একজন অলংকারে সজ্জিতা নারী একাকী সফর করবে, অথচ এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করার প্রয়োজন হবে না।" ঠিক এমনি একটি সমাজ রাসূল (স.) উপহার দিয়েছিলেন বিশ্বকে।

যে সমাজে প্রতিবেশীর হাত ও মুখের অত্যাচার থেকে অপর প্রতিবেশী নিরাপদ, যে সমাজে পরস্পরের জন্য ভালোবাসা প্রকাশ পায় কাজ ও আচরণের মাধ্যমে। যেমন রাসূল (স) বলেছেন, "প্রতিবেশীর জন্য হাদিয়া পাঠাও, তা যদি ছাগলের খুরের মতো ক্ষুদ্র জিনিসও হয়।" "পরস্পরকে সালাম দাও, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।" "কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসলে তাকে ভালোবাসার কথা জানাও।" "কারো গবাদিপশুর দ্বারা কোনো ক্ষতি হলে তুমি যদি সবর কর, তোমার আমলনামায় সদকা সমতুল্য সওয়াব লেখা হবে।"

এমনি অসংখ্য দিকনির্দেশনায় তৈরি একটি জান্নাতি সমাজ, একটি সওয়াবের বাগিচা, যে বাগিচায় গাছে গাছে সওয়াবের ফুল ফোটে, নেকীর ফল ধরে। পাপের আগাছা যেখানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। যেখানে কঠোর হস্তে দমন করা হয় অন্যায়-যুলুম, কুটিলতা ও ইবলিসের কুমন্ত্রণা। যে সমাজে বাস্তবায়িত হয় কুরআনের আইন। যে সমাজে সুনির্দিষ্ট চুরি করার শাস্তি হাত কেটে দেওয়া, ব্যভিচারের শাস্তি রজম করা, সাধ্বী নারীর নামে অপবাদের শাস্তি প্রকাশ্যে ৮০ঘা চাবুক মারা, যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা, সুদের মতো জঘন্যতম পাপ সমাজ থেকে উৎখাত করা, সর্বস্তরে নামায কায়েম করা, কুরআনই হবে যে সমাজের চালিকাশক্তি ও সংবিধান। যে সমাজে কেউ কারো গীবত করবে না। কাউকে অপমানিত-অপদস্থ করবে না। তারা পরস্পরে ভাই ভাই হবে। এক মু'মিন অপর মু'মিনের আয়না হবে। একজনের বিপদ-মুসিবতে আরেকজন উপকার করবে আন্তরিকভাবে।

সেই সমাজের চিত্র রাসূল (স) কী সুন্দর করেই না এঁকেছেন কথার রং-তুলিতে। "মুসলিম সমাজ হবে মানবদেহের মতো, যার এক অঙ্গে আঘাত পেলে গোটা দেহ কষ্ট অনুভব করে।" তার মানে, একটা আঙুলে আঘাত পেলে যেমন পুরো দেহটা কষ্ট পায়, তেমনি সমাজের কেউ কষ্টে থাকলে সমাজের সবাই উপলব্ধি করবে, কষ্ট নিরসনের চেষ্টা করবে।

এমন একটি সমাজ যদি আমরা গড়তে চাই তাহলে প্রয়োজন কুরআন হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এর কোনো বিকল্প নেই, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়

www.amarboi.org

হলেও সত্য, আজ মুসলিম সমাজ সেই শিক্ষা থেকে সরে গেছে অনেক অনেক দূরে।

তাই ইসলামের নামে মুসলিমদের ঘরে চলছে অসংখ্য অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড। ইবাদতের নামে চলছে শিরক-বিদআত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে গেছে কুরআন হাদীসের শিক্ষা। সে স্থান দখল করেছে কুশিক্ষা, কুসংস্কার। ইসলামের পূত-পবিত্র নৈতিকতাকে নির্বাসন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে পাশ্চাত্যের নোংরা নৈতিকতাবর্জিত কুশিক্ষা আর অন্য সংস্কৃতি। ছায়া সুশীতল জান্নাতি গুলবাগে যেন প্রবেশ করেছে এক প্রকাণ্ড আজদাহা। যে মুসলমান নিজের জীবন কুরবানী দিয়ে অপরকে রক্ষা করত, আজ তাদের ঘরে জন্ম নিচ্ছে মানবতাবিধ্বংসী এক ভয়ংকর সন্ত্রাসী। এ অবস্থার একমাত্র কারণ, ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজে মুসলমান স্থবির হয়ে পড়েছে। অপরের কাছে দাওয়াত পৌছানো দূরে থাকুক, নিজেরাই হারিয়ে ফেলেছে সেই অমূল্য শিক্ষা। যে তরবারির ছায়ার নিচে ছিল জান্নাত, সেই তরবারির ইস্পাত গলিয়ে তারা তৈরি করেছে সেতারার তার। মুজাহিদের সন্তানেরা খ্যাতি লাভ করছে গানের উস্তাদ হিসেবে। এক সময় যারা এ দেশে দাঈ' ইলাল্লাহ'র দায়িত্ব পালন করেছে তাদের সন্তানেরাই প্রাণপণে বিরোধিতা করছে ইসলামের। যার কারণে নেমে এসেছে আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি। আজ সারা বিশ্বে মুসলিম নির্যাতিত হচ্ছে চরমভাবে। আখিরাতেও রেহাই পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার রাস্তা একটিই আছে, তা হলো অধিক পরিমাণে কুরআন-হাদীস চর্চা করা, তার শিক্ষা প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করা। কুরআনের কিছু আয়াত মানা আর কিছু আয়াত অমান্য করে নয়; আল-কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার মধ্যে আছে মুক্তি। এ কথাই যুক্তি ও হিকমতের সাথে পৌছে দিতে হবে প্রতিটি মুসলিম হৃদয়ের কাছে। আর এ পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব অনেকাংশে পালন করতে পারে একটি ইসলামী পত্রিকা।

সভা সমিতি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ভালো কোনো বইয়ের চেয়েও পত্র-পত্রিকা বেশি সুচারুরূপে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে কোনো বক্তব্য মাত্র কয়েকজনের কাছে তুলে ধরা যায়। তারপর বর্তমানে মানুষ এত ব্যস্ত যে, সভা-সেমিনারে তাদের হাজির করানো যায় না। অনেকের মতে বই পড়ার ব্যাপারও সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। বিষয়ও নির্দিষ্ট। আর পত্রিকা যেহেতু, ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। তারপর বিভিন্ন আঙ্গিকে ইসলামের বিভিন্ন রূপ পত্রিকায় তুলে ধরা যায়। একই পত্রিকায় তাফসীরে কুরআন মজীদের তাফসীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিষয়ের প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক গল্প, কবিতা, হাম্‌দ, নাত, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার

www.amarboi.org

সমাধানসহ আরো অনেক বিষয়ই তুলে ধরা যায়। তাই ইসলামী সমাজ তথা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইসলামী পত্রিকার ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণস্বরূপ: ইসলামী পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, পয়লা এপ্রিল ছিল একটা আনন্দের দিন। পরস্পরকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর মজাই ছিল আলাদা। এটা যে কত বড় একটা জঘন্য কাজ, আহাম্মকির কাজ- এ বুঝ তো আমাদের শিক্ষকদেরই ছিল না, আমাদের থাকবে কী করে?

যারা এ নিষ্ঠুর খেলার গোড়ার কথা জানতেন, তারা পত্রিকার মাধ্যমেই প্রচার করেছেন। তাই তো আজ সমাজের সর্বস্তর থেকে উঠে গেছে এ নির্মম ধোঁকাবাজির খেলা। স্কুলের ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত জেনে গেছে সেই মর্মান্তিক কাহিনী।

ইসলামী পত্রিকার মাধ্যমে আমরা কুরআন-হাদীসের শিক্ষা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। অচেতন মুসলমানদের সচেতন করার দায়িত্ব নিতে পারি। মুসলিম নারী পুরুষ উভয়েরই এ ব্যাপারে সজাগ হওয়া প্রয়োজন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

"মু'মিন পুরুষ মু'মিন নারী পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী। তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায়, পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে।" (সূরা তাওবা : ৭১)

তাই প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর অবশ্য কর্তব্য ইসলামী পত্রিকার প্রচার প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করা।

আমরা সবাই জানি, মানব জন্মলগ্নেই চিরশত্রু ইবলিসের আবির্ভাব, আর ইবলিস সদা তৎপর আদম সন্তানের বিরোধিতায়। বর্তমানে তার প্রধান হাতিয়ারই অনৈসলামিক কুরুচিপূর্ণ পত্রিকা, তার বিপরীতে ইসলামী পত্রিকা তো হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র। তাই ইসলাম প্রচার প্রসারের কাজ বেগবান করতে হলে আরো ইসলামী পত্রিকা প্রকাশ করা উচিত। প্রকাশিত পত্রিকাগুলো যাতে অর্থাভাবে, প্রচারাভাবে বন্ধ হয়ে না যায়, মুসলিম দাবিদার প্রত্যেক নর-নারীকে সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

প্রত্যেক কলম সৈনিকের নিকট আমার আহ্বান, আসুন মিডিয়া জিহাদে অংশ গ্রহণ করি জান ও মাল দিয়ে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কবুল করুন মুজাহিদ হিসেবে! আমীন।

~~০০০০০~~

www.amarboi.org

৫. আযওয়াজ-সাথী

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন, প্রাচীন, আদিম এবং প্রথম যে সম্পর্কসূত্রে আল্লাহ তাআলা মানুষকে বেঁধেছেন, সে সম্পর্ক হলো কুরআনের ভাষায় 'আযওয়াজ'- জোড়া বা সাথী। আমরা এ ভারত উপমহাদেশীয় ভাষায় বলি, স্বামী-স্ত্রী। এ পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য মানব বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ প্রথম যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তা এ জোড়া বা সাথীর সম্পর্ক। এরপর এসেছে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান ও অন্যান্য সম্পর্ক।

তাই তো এ সম্পর্কটা সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে দায়িত্বসপূর্ণ। এ সম্পর্ক ছাড়া পৃথিবীটা অচল। যে সংসারে এ সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা যত মযবুত করেছেন, সে সংসার তত সুশৃঙ্খল। যে সমাজে এ সম্পর্ক যত সুন্দর, সে সমাজ তত শান্তিপূর্ণ। এই সম্পর্কের ওপর নির্ভর করছে সমাজ, সংসার তথা রাষ্ট্রের সুখ-শান্তি। এর মাঝেই নিহিত সকল স্বস্তি। চারিদিকে তাকালেই দেখা যাবে, যে পরিবারের জোড়া বা সাথীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো নেই, সে পরিবার যেন একটা জাহান্নাম। সন্তানগুলো মানুষ হয় না। আর এমনি একাধিক সংসার নিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠবে তা কী করে শান্তিপূর্ণ সমাজ হবে? তাইতা কবি বলেছেন-

"প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে
যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
আমাদের কুঁড়ে ঘরে।"

এ সম্পর্কের কথা ভাবতে গেলে সত্যিই বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভিন্ন দেশের দু'জন মানুষ- কেউ হয়তো কাউকে চেনেই না। অথচ বিয়ের মাধ্যমে জোড়া বা সাথী হয়ে যাওয়ার পর কী নিবিড়, কী গভীর সে সম্পর্ক। আল্লাহ্ তা'আলা দু'জনের মধ্যে কী দয়ামায়া, স্নেহ, ভক্তি ও ভালোবাসার একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। দু'জনের চাওয়া-পাওয়া সব এক হয়ে যায়। দু'জনের একই সংসার, একই সন্তান। এ জোড়ার সম্পর্কের মাধ্যমে পরস্পরের ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে, দু'জনের ভালো লাগা, ভালোবাসা এমনকি স্বভাব-চরিত্র পর্যন্ত একই রকম হয়ে যায়। আর যেখানে মিল-মহব্বত হয় না, সেখানেই অশান্তি। এ সুসম্পর্ক নির্ভর করে মূলত বিশ্বাস ও দায়িত্বানুভূতির ওপর। যে দম্পতি পরস্পরের প্রতি যত দায়িত্বানুভূতির প্রমাণ দিতে পারবে, দায়িত্ব-কর্তব্য যত সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারবে, তাদের সম্পর্ক তত সুন্দর, মযবুত ও সাবলীল এবং শান্তিপূর্ণ হবে। আমাদের সমাজে যত সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, খুনী, মাস্তান আর বখাটে

www.amarboi.org

আছে, তাদের প্রত্যেকের পেছনে খুঁজলে দেখা যাবে, তাদের মা-বাবার সম্পর্ক ভালো নেই। যে সন্তানের মাকে তার বাবা ভালোবাসে না, মর্যাদা দেয় না, যখন-তখন অপমান করে, সে মহিলাকে তার সন্তানরাও মর্যাদা দেয় না, আবার যে পুরুষকে তার স্ত্রী সম্মান করে না, মর্যাদা দেয় না, তার সন্তানরাও বাবাকে সম্মান করে না, ঘৃণা করে। মা-বাবার প্রতি এ অমর্যাদা, অসম্মান আর ঘৃণা নিয়ে বড় হয় যে সন্তান, সে কী করে ভালো হতে পারে? আর তাই তো এই জোড়া বা সাথীর সম্পর্ক সুন্দর, সাবলীল, ভারসাম্যপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ রাখার জন্য ইসলামের এত জোর তাকিদ। কোনো অবস্থাতেই যেন এ সম্পর্কে ফাটল না ধরে। সূরা বাকারার কিয়দংশ আর সূরা নিসার তো প্রায় পুরোটা তারই দিকনির্দেশনা। রাসূল (স) বলেছেন, "যে মহিলার সাথী তার প্রতি অসন্তুষ্টি নিয়ে রাত কাটাল, তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। যদিও সে সারারাত নামায পড়ে এবং সারাদিন রোযা রাখে।" তিনি আরো বলেন, "ওই পুরুষ উত্তম, যে তার স্ত্রীর বিবেচনায় উত্তম।" (তিরমিযী)

"ওই খাদ্যটুকু সর্বোত্তম সদকা, যেটুকু পুরুষ তার স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

উপরিউক্ত হাদীসগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের সংসার কি শান্তি ময় না হয়ে পারে?

তারপর এমন একটা বয়স বা সময় আছে, যখন এ দু'জন মানুষের এ দু'জন ছাড়া আপন বলতে আর কেউ থাকে না। বাবা-মা মারা যান। সন্তান বড় হয়ে যে যার মতো হয়ে যায়। ভাইবোন যার যার সন্তান-সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিংবা দূরে চলে যায়। তখন এ দু'জন পরস্পরকে যেমন অনুভব করে, তেমন আর কেউ করে না। কলিজার টুকরো দেহের অংশ সন্তানরাও পর হয়ে যায়। তার কাছে তখন আর মনের কথা বলা যায় না (বিশেষ করে ছেলেদের কাছে, যে ছেলের জন্য মা পাগলপারা থাকত)। সামান্য কিছু খেতে ইচ্ছা করলেও বলতে লজ্জা লাগে।

কিন্তু জীবনসাথী বা জোড়া পরস্পরের কাছে কোনো কথা বলতে, কোনো কিছু চাইতে, দৈহিক যে কোনো ধরনের সমস্যার কথা বলতে কোনো রকম লজ্জা নেই, সংকোচ নেই। এমন তো আর কারো সাথে সম্ভব নয়। তাই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মজীদে বলেছেন, 'আযওয়াজ' পরস্পরের পোশাক সমতুল্য। কী সুন্দর উদাহরণ! কত সুন্দর করেই না আল্লাহ্ তা'আলা আযওয়াজ- এর সম্পর্কটা তুলে ধরেছেন। আর তাঁর নির্দেশাবলির মধ্যে একটি, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও। তিনিই পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

www.amarboi.org

সংসারে স্ত্রী, সন্তান এবং আরো অনেকের মধ্যে মা একজন। সন্তানরাও এক সময় উচিত-অনুচিতের মাপকাঠিতে মায়ের কথা ভাবে, কিন্তু জীবনসাথীর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষের সকল চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হয় স্ত্রীকে কেন্দ্র করে- এটাই যেন স্বাভাবিক, কিন্তু এর বিপরীত যে নেই তা নয়। প্রচুর আছে। পত্রিকা খুললেই তথাকথিত স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, নারী নির্যাতন আর নিপীড়নের ভুরি ভুরি প্রমাণ আমরা পাই। আবার স্ত্রীর হাতে স্বামী খুনের ঘটনাও আছে। তবে কম। নারীরাই নিগৃহীত, নিপীড়িত হচ্ছে বেশি, কিন্তু এটা সম্পর্কের সাধারণ রূপ নয়, এটা কাম্যও নয়। এর নাম সম্পর্কের বিকৃতি। যখনই সংসারে এ বিকৃতি দেখা দেয়, তখনি জ্বলে উঠে অশান্তির আগুন। কোনো সমাজে যখন এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজ হয়ে পড়ে অশান্তিময়, রীতিমতো নরককুণ্ড।

আর বর্তমানে যেন এরই অনুশীলন চলছে। ইবলিস তার শিষ্যদের নিয়ে বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ পূত-পবিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্কটা ধ্বংস করার জন্য যেন কোমর বেঁধে নেমেছে। মানুষের জন্মলগ্নের দুশমন এ ইবলিস। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে চ্যালেঞ্জ করে এসেছে- "আদম সন্তানকে জাহান্নামী করবেই।" সেই জাহান্নাম তো মৃত্যুর পরে। এখন ইবলিসের প্রচেষ্টা আমাদের দুনিয়াটাই জাহান্নামে পরিণত করা। তাই আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের উচিত এ সর্বোত্তম সম্পর্কটা লালন করা, ধরে রাখা, অটুট রাখা। এ সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখতে হলে, সজীব রাখতে হলে তিনটি বিষয় জানা এবং মানা একান্ত প্রয়োজন :

প্রথম ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো আখিরাতের ওপর প্রচন্ড বিশ্বাস বা জবাবদিহিতার ভয়।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ।

তৃতীয়ত, দাম্পত্য জীবনে মানিয়ে ও ছাড় দিয়ে চলা।

আসুন আমরা এ সুন্দর ও সাবলীল একান্ত প্রয়োজনীয় এই সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখি। টিকিয়ে রাখি সংসার ও সমাজকে, তা হলেই হাতের মধ্যে ধরা দেবে দুনিয়ার শান্তি। কবির ভাষায়- 'স্বর্গ আসিয়া দাঁড়াবে তখন আমাদের জীর্ন কুটিরে।'

'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবান্নার।' (সূরা বাকারাঃ ২০১)

θθθθθ

www.amarboi.org

৬. গীবতঃ একটি ঘৃণিত অপরাধ

গীবতের সংজ্ঞা হচ্ছে, "কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।" স্বয়ং রাসূল (স) থেকে এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, গীবত হচ্ছে তুমি তোমার ভাইয়ের কথা এমনভাবে বললে, যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যি থেকে থাকে, তাহলে? তিনি বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তা হলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি তার মধ্যে না থাকে তা হলে অপবাদ আরোপ করলে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

রাসূল (স)- এর এ বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করা অপবাদ, আরবীতে যাকে বলে বুহতান। আর তার সত্যিকার দোষত্রুটি বর্ণনা করা গীবত, বাংলায় যাকে বলে পরনিন্দা।

এ কাজ সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে হোক কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে হোক, তা সর্বাবস্থায় হারাম। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

"আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? দেখ, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরা হুজরাত, আয়াত-১২)

উপরিউক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজ যে কতখানি ঘৃণ্য ও জঘন্য, তা বোঝাতে চেয়েছেন। প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে কি না? তার অন্তর যদি এ কাজে ঘৃণা বোধ করে তা হলে কীভাবে সে এ কাজ করতে পারে যে, সে তার কোনো মুমিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান-মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে, যেখানে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে না। এমনকি সে জানেও না, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ, যার গীবত করা হচ্ছে, সে জানতে পারলে মনে কষ্ট পাবে; বরং কোনো ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার দুর্নাম করা মূলতই হারাম। তা সে জানুক বা না জানুক, সে কষ্ট পাক বা না পাক।

সূরা হুমাযায় আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাই বলেছেন, "ধ্বংস এমন প্রতিটি লোকের জন্য, যে (সামনাসামনি) ধিক্কার দেয় ও (পিছনে) নিন্দা করে বেড়ায়।"

www.amarboi.org

আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত, "মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে রজম করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী করীম (স) শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলছে, লোকটার অবস্থা দেখ, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন, কিন্তু যতক্ষণ না কুকুরের মতো হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়ে নি। সামনে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবীজী থেমে গেলেন। ওই দু'ব্যক্তিকে বললেন, তোমরা দু'জন গিয়ে ওই গাধার পচা মৃতদেহটা আহার কর! তারা দুজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স), কেউ কি তা খেতে পারে? নবী করীম (স) বললেন, "তোমরা এ মাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে, তা এ গাধার মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নোংরা কাজ।"

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, "গীবত হলো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।" সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, গীবত কী করে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক? হুযুর (স) বললেন, কোনো ব্যক্তি ব্যভিচারের পরে যখন তাওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেন, কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে, আল্লাহ তাকে মাফ করবেন না। (বায়হাকী, মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি গীবত করে তার ভালো ভালো আমলগুলো তার আমলনামায় তুলে দেওয়া হয়, যার গীবত সে করেছে।" এ হাদীসের কারণেই বায়েজিদ বোস্তামী (র) এক কাঁদি খেজুর নিয়ে সে ব্যক্তিকে দিয়েছেন, যে তাঁর গীবত করেছে। আর মুসলিম জাহানের কিংবদন্তী তুল্য আলেম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেছেন, "গীবত যদি করতেই হয় তাহলে মায়ের গীবত কর। ভালো আমলগুলো পরকে দেবে কেন? মাকেই দাও।"

গীবতের সীমারেখাঃ

ফাতেমা বিনতে কায়েস নামক এক মহিলাকে দু'ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেন, একজন হযরত মু'আবিয়া (রা) আর অপরজন আবু জাহাম (রা)। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবী করীম (স)- এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন, মু'আবিয়া নিঃস্ব, তার কোন সম্পদ নেই, আর আবু জাহাম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে। (বুখারী ও মুসলিম)

এখানে একজন নারীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল, তা তিনি তাকে জানিয়ে দেওয়া জরুরি মনে করেন।

আরো বেশ কিছু হাদীস এমন আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এই বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত তখনই বৈধ, যখন শরী'আতের

www.amarboi.org

দৃষ্টিতে সঙ্গত কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন হয়। এ বিধির উপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবত বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন :

ক. যে ব্যক্তি যুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায়, এমন ব্যক্তির কাছে যালিমের বিরুদ্ধে নালিশ করা।

খ. সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তির কাছে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা, যে তার প্রতিকার করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গ. মানুষকে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করা। যেমন- হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব। এ ছাড়াও কোনো ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, কিংবা কারো বাড়ির পাশে বাড়ি খরিদ করতে চায়, অথবা কারো সাথে অংশীদারি কারবার করতে চায়, সে যদি পরামর্শ চায় তাহলে ওই ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি জানানো ওয়াজিব।

ঘ. ফতোয়া চাওয়ার সময় কোনো মুফতী সাহেবের কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোনো ব্যক্তির একান্ত কাজকর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

ঙ. যেসব লোক গুনাহ ও পাপকার্যের বিস্তার ঘটায় অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার চালায়, অথবা আল্লাহর বান্দাদের ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড ও যুলুম-নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা।

চ. যেসব লোক মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত যে, ওই নাম ছাড়া কেউ তাকে চেনেই না, তখন পরিচয় দানের জন্য ওই নাম ব্যবহার করা।

এ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলো ছাড়া কারো গীবত করা একেবারেই হারাম। গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, গীবত করে ফেলেছে, তখন তার প্রথম কাজ হবে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয় কাজ যতদূর সম্ভব এর ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোনো মৃত ব্যক্তির গীবত করে তা হলে তার মাগফিরাতের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া করবে। আর জীবিত ব্যক্তির গীবত করলেও তার জন্য দোয়া করবে। সাথে সাথে আর কখনো তার গীবত করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেবে। সে যদি গীবতের বিষয়টি জেনে যায়, তাহলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। আর যার গীবত করা হয়েছে সে যদি বিষয়টা না জানে তাহলে তাকে জানানোর প্রয়োজন নেই, তাওবা করলেই চলবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে গীবতের মতো অপরাধ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

০০০০০

www.amarboi.org

৭. শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি

শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির সুফল কিছু থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কুফলটাই বেশি। কোনো বেকার যদি টিউশনি করে তা ভিন্ন কথা, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি করা সম্পূর্ণ অনুচিত। কারণ, যে শিক্ষক যে বিষয়ে প্রাইভেট পড়ান, স্কুল বা কলেজে তিনি সে বিষয়েরই শিক্ষক। স্কুল-কলেজে তিনি যদি ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো করে পড়ান, বোঝান, তাহলে তো ওই ছাত্র-ছাত্রীর প্রাইভেট পড়তে হয় না। আমাদের দেশের সরকারি হাসপাতালের বেতনভুক ডাক্তার আর শিক্ষকদের নৈতিকতা একই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার যেমন সরকারি হাসপাতালের বেতন নিয়ে নিজস্ব ক্লিনিকে রুগীদের কাছ থেকে মোটা অংকের ভিজিট নিয়ে চিকিৎসা করেন, শিক্ষকরাও তেমনি। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। অথচ তাদের কার্যকলাপ দেখলে অবাক হতে হয়। শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়ার কারণে স্কুলে অনেক ভালো শিক্ষার্থী ক্লাসে মেধা তালিকায় থাকে না। তারপর দেখা যায়, শুধুমাত্র শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ার কারণেই অনেক নিম্নমানের ছাত্রও ভালো রেজাল্ট করছে। কারণ শিক্ষক তাকে পরীক্ষার আগে সব জানিয়ে দেন।

এ জন্য যারা শিক্ষা চায় না, পাস চায়, তারা শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়তে যায়। এসব শিক্ষকের টিউশন ফি'র পরিমাণটাও বিরাট। যে অভিভাবকের ৩/৪ জন ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে, তার যে কী করুণ পরিণতি, তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির কুফলের আরেকটা বড় দিক হলো বেকার সমস্যা। যে শিক্ষক স্কুলে-কলেজে চাকরি করছেন শিক্ষক যদি টিউশনি না করতেন তাহলে আমাদের বেকার যুবসমাজ এ কাজটা করতে পারত। বেকার যুবকরা বা ছাত্ররা যে টিউশনি করে না তা নয়, কিন্তু যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা কিংবা অভিভাবকরা শিক্ষকের কাছে পড়ানোর সুযোগ পায়, সেখানে অন্য কারো কাছে পড়তে বা পড়াতে চায় না। অপরদিকে ছাত্ররাও পড়াশোনা করার মনমানসিকতা হারিয়ে স্যারের দেওয়া সাজেশনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আমি মনে করি, স্বেচ্ছায় যদি শিক্ষকরা এ কাজ না ছাড়ে তবে সরকারের উচিত আইন করে শিক্ষকদের এ গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখা।

θθθθθ

www.amarboi.org

৮. সন্ত্রাসের নেপথ্যে আসলে কারা?

সন্ত্রাসের নেপথ্যে আসলে কারা? এ প্রশ্নের উত্তর হলো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসা আর লোভ-লালসা- এ থেকেই জন্ম নেয় সন্ত্রাস। নীতি-নৈতিকতা, মানবতাবোধ, জ্ঞান-আদর্শ বর্জিত উপাদানই সন্ত্রাসের জনক-জননী। একে লালন করে তথাকথিত রাজনৈতিক এমন কিছু নেতা ও সরকারি আমলা, যাদের দেখতে মানুষের মতো দেখায়, কিন্তু ভিতরটা হয়ে গেছে হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের কথাই পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেছেন-

"আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে সবচেয়ে নীচদের চেয়েও নিচে নামিয়ে দিয়েছি। অবশ্য তাদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে ...।" (সূরা তীন : ৪-৬)

এই যে আল্লাহর বাণী, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা ছাড়া আর সবাই দৈহিক কাঠামো সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও নীচদের চেয়েও নিচে নেমে গেছে, এরা কারা? এদের কি আমরা চিনি না? সন্ত্রাসের নেপথ্যে এরাই। কুরআন মজিদে আরো বলা হয়েছে-

"একে অপর থেকে বেশি (পাওয়ার এ চিন্তা-ধান্ধা নিয়েই) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।" (সূরা তাকাসুর : ১-২)

ক্ষমতা আর সম্পদের মোহই মানুষকে সন্ত্রাসী বানায়। আমাদের পাড়ায় ছিঁচকে সন্ত্রাসী থেকে শুরু করে বিশ্ব সন্ত্রাসী 'বুশ' পর্যন্ত সবারই একই মোহ- সবার চেয়ে বড় হব- সবাই আমাকে ভয় করবে, সবাইকে পায়ের নিচে রাখব। নমরুদ, ফিরাউন, কারুন, হামান সবাই সন্ত্রাসী ছিল তার কারণ একটাই। আমাদের দেশ এ ক্ষুদ্র বাংলাদেশ। আদমশুমারি অনুযায়ী এখানে ৯০% মুসলমান। তবে প্রকৃতপক্ষে কুরআন-হাদীস বুঝে এমন মুসলমান খুব কমই আছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তো নেই বললেই চলে। এ নেতা-নেত্রীরাই কখনো সরকারি দলে কখনো বিরোধী দলে থাকে। এদের ছত্রছায়ায়ই প্রতিপালিত হয় এসব সন্ত্রাসীরা। প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ঠিকই; কিন্তু পুলিশ তো তাদের থানায় আটকে রাখতে পারে না। কোনো মন্ত্রী কিংবা নেতার টেলিফোন পেলে ঠিকই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই তো তাদের মুখে আস্ফালন শোনা যায়, "থানায় নিয়ে লাভ কী? ধরে রাখতে পারবেন তো?" দেশবাসীর সামনেই এর প্রমাণ আছে। এরশাদ শিকদার, জয়নাল হাজারী, পিচ্চি হান্নান, পিচ্চি হেলাল। এরা সবাই বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের পোষা সন্ত্রাসী। আর জয়নাল হাজারী তো নিজেই সন্ত্রাসের গডফাদার।

www.amarboi.org

আরবে প্রাক ইসলাম যুগে সন্ত্রাস ছিল একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। সেই সমাজে বসে রাসূল (স) বললেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন সানা থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত অলংকারে সজ্জিতা এক সুন্দরী রমনী একা একা ভ্রমণ করতে পারবে, পথে আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কাউকে ভয় করতে হবে না।" এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ, সমাজ ইসলামী আইন মোতাবেক চললে সন্ত্রাসের প্রশ্নই উঠে না এমনকি সেখানে সন্ত্রাসের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। সমাজ তথা বিশ্বের দিকে নজর দিলেই আমরা দেখি, যে দেশ বা যে সমাজ ইসলাম থেকে যত দূরে, সেখানেই সন্ত্রাস ততো বেশি। যেমন পাশ্চাত্য সমাজ। সৌদী আরব ও ইরানের দিকে তাকালে দেখা যায়, ওই দেশ দুটিতে সন্ত্রাস নেই বললেই চলে।

আমাদের দেশটিও যদি ইসলামী হুকুমত অনুযায়ী চলে, আমাদের নেতা-নেত্রীরা যদি কুরআন-হাদীস থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্ণ মুসলমান হয় (শুধু হজ্জ করা ওমরা করা নয়), তাহলেই সন্ত্রাস দূর হবে। কারণ, সন্ত্রাসের নেপথ্যে আছে স্বয়ং ইবলিস। নীতিজ্ঞান বর্জিত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ঘাড়ে ইবলিস সওয়ার হয়। তখন তাদের কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাদের সামনে তখন আর দেশ, মানুষ, মানবতা, মানবাধিকার, দেশের উন্নতি কিছুই থাকে না। থাকে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি। নিজের ভোগ-বিলাস আর ক্ষমতার দাপট দেখানোর স্পৃহা।

সন্ত্রাসের বিষফল থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইলে তার বিষবৃক্ষটাই গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। গাছ থাকলে ফল তো ধরবেই। সন্ত্রাসের নেপথ্যে যে বা যারা আছে তাদের নিশ্চিহ্ন করলেই তো হবে না। তাদের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে এ সমাজকে, এ দেশকে, এ মানবতাকে। আর সেই রক্ষাকবচের নাম হলো ইসলাম। তাই তো মহান আল্লাহ বলেন-

"তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও আর শয়তানের দেখানো পথে চলনা। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা আল বাকারা : ২০৮)

০০০০০

www.amarboi.org

৯. বিয়ের পাত্র

আমার ছোট বোনের বিয়ের ঘটনা সত্যি মনে রাখার মতো একটি ব্যাপার। তাই সুযোগ পেয়ে সবাইকে জানানোর জন্য এ লেখার অবতারণা।

আমার বড় মামা স্কুল মাস্টার। কয়েকজন মেহমান নিয়ে একদিন আমাদের বাসায় এলেন আমার ছোট বোন মাহমুদার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। পাত্রের বোন-ভগ্নিপতি আর বড় ভাই এসেছেন। এদের সবার মেয়ে পছন্দ হলে ছেলেকে খবর দেওয়া হবে। ছেলে খুলনায় থাকে। ছেলে মেয়ে দেখে পছন্দ হলেই বিয়ে হয়ে যাবে। পরে অনুষ্ঠান করা যাবে। এমনি কথাবার্তা, কিন্তু আমরা বিশেষ করে আমি ছেলের ভগ্নিপতি আর তার ভাইকে মেয়ে দেখাতে রাজি হলাম না। যেহেতু ইসলাম এ ধরনের দেখার অনুমতি দেয় না। তবে বোনকে দেখানো হলো। বোনের মেয়ে পছন্দ হলো, খুলনা থেকে ছেলেকে আসার জন্য খবর পাঠানো হয়। খুলনা থেকে যশোরের দূরত্ব খুব একটা বেশি না। বিকেলের মধ্যে ছেলে (পাত্র) তার দুজন বন্ধুকে নিয়ে হাজির হয়ে গেল। মাগরিবের পর মেয়ে দেখানো হবে, কিন্তু মাগরিবের পর নিচে বৈঠকখানায় মেহমানদের বসিয়ে রেখে আব্বা যখন ওপরে এলেন তখন তাঁর চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। কী হয়েছে আব্বা? বলতেই আব্বা আমাকে ইশারায় বসতে বললেন। আব্বাও বসলেন। বললেন, এখানে আমি মেয়ে বিয়ে দেব না। অতএব দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

- কেন আব্বা?

- ছেলে কম্যুনিস্ট। সিগারেট খায়। হয়তো নামাযও পড়ে না। তোমার মামা কী করে আমার মেয়ের জন্য এমন পাত্র নিয়ে এল। অসম্ভব, কিছুতেই আমি এখানে মেয়ে বিয়ে দেব না। কথা বলতে বলতে আব্বা একটু উত্তেজিত হয়ে গেলেন।

ছেলের বোন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আস্তে করে বলল, কী হয়েছে আপা? আমি তার হাতখানা হাতে নিয়ে বললাম, আপনার ভাই কি নামায পড়ে? সে ম্লানমুখে যা বলল, তার সারমর্ম: ভাই তো তার কাছে থাকে না, নামায পড়ে কি পড়ে না তা তিনি সঠিক জানেন না। আর এখন না পড়লেই বা কী, আরেকটু বয়স হলে ঠিকই পড়বে। এ বয়সে অনেকেই পড়ে না। তাই বলে কারো বিয়ে আটকে থাকে না। আর রাজনীতি করায় কে কোন দল করল, তা কি বিয়ের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয়? ছাত্র জীবনে তার ভাই জাসদ করত। এখন কম্যুনিজমের ভালো কর্মী। নামায পড়ে না ঠিকই, তবে স্বভাব-চরিত্র খুবই ভালো, ইত্যাদি।

ইতোমধ্যে মামা এলেন। তিনি বললেন, "কী ব্যাপার! মাগরিবের পরেই মেয়ে দেখানোর কথা ছিল। ওরা তো মেয়ে এখনই দেখতে চাচ্ছে ...।"

www.amarboi.org

মামাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "মামা! আব্বা তো মেয়ে দেখাতে চাচ্ছেন না।" অবাক হয়ে মামা জানতে চাইলেন, কেন? মামাকে সব খুলে বললাম, মামা এবার রেগেই গেলেন। তোমার বাবার এ এক বাতিক। মেয়ের বিয়ের সময়ও তার রাজনীতি।

না মামা, আমরা শান্তি চাই। আমি মামাকে বোঝাতে চাইলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা তো সব তোমার বাপের ছাত্রী। ভালো ছেলে। ৩০০ বিঘা জমির মালিক। কোনো দাবি-দাওয়া নেই, তা দেখার নাম নেই; কোন্ দল করে তা নিয়েই তোমাদের মাথা ব্যথা। কর, যা ভালো বোঝ কর। আমি এর মধ্যে নেই। আমি কাল ভোরেই বাড়ি চলে যাব।

আমার মা এসে তাঁর ভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। "সোনা ভাই, রাগ করিস না। জেনে-শুনে বেনামাযী ছেলের কাছে মেয়ে দেব নাকি?" মামা আরো রেগে গেলেন। আপা, তুমিও এদের মতো হয়ে গেলে। এ বয়সী আধুনিক ধনী লোকের ছেলে কে কোথায় নামায পড়ে?

অনেক রাগারাগি, কথা কাটাকাটির পর এক পর্যায়ে আমি বললাম, মামা, আমি আগে ছেলেটার সাথে একটু কথা বলব। মামা রাজি হলেন। ছেলেকে দোতালায় ডেকে আনা হলো। আমি পর্দার এ পাশে বসলাম। ছেলে এবং ছেলের বন্ধু ওপাশে বসল।

ভাই দেলোয়ার ফরাজি, আস্সালামু আলাইকুম! আমি মাহমুদার বড় বোন।

ওয়া আলাইকুম আস্সালাম। আমাদের কেন ডেকেছেন?

ভাই আপনার সাথে আমার ছোট বোনের বিয়ের আলোচনা চলছে। এখন মেয়ে দেখার কথা, কিন্তু ভাই, মেয়ে দেখার আগে আপনি আমাদের পরিবেশ দেখেন। পরিবেশ দেখে পছন্দ হলে মেয়ে দেখানো হবে। পরিবেশই যদি পছন্দ না হয় তাহলে আর মেয়ে পছন্দ করে লাভ কী?

আপনাদের পরিবেশের কথা বলেন। এই যে আমি আপনার সাথে কথা বলছি, অথচ আপনার সামনে যাচ্ছি না। এ কি আপনার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে না?

- তা অবশ্য লাগছে।

আপনার স্ত্রীও ঠিক এমনি করবে। আপনি চাইবেন আপনার স্ত্রী আপনার বন্ধুদের সামনে এসে আপ্যায়ন করুক। আপনার ভগ্নিপতির সামনে খোলামেলা হেসে-নেচে গল্প করুক। আপনার সঙ্গে সেজেগুজে সিনেমায় যাক, কিন্তু আপনার স্ত্রী তা করবে না। তখন আপনি কী করবেন?

- আমি তার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দেব না।

www.amarboi.org

বেশ ভালো কথা, কিন্তু সে যে আপনার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দিয়ে বসবে। তখন আপনি কী করবেন?

- যেমন?

যেমন আপনি হয়তো ঠিকমতো নামায পড়েন না, আপনার স্ত্রী আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যাওয়ার জন্য তাকিদ দিতে থাকবে। আপনি ধূমপান করবেন, আপনার স্ত্রী এটা একদম পছন্দ করে না। আপনি আপনার বন্ধুর স্ত্রী, মামাত-খালাত বোন, ভাবীদের সাথে খুব খোলামেলা হাসিগল্প করেন; কিন্তু আপনার স্ত্রী এসব পছন্দ করবে না। তখন .....?

- কথা শেষ না হতেই ওপাশ থেকে দেলোয়ারের বন্ধু একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল। এতসব দাসখত লেখে বিয়ে করতে হবে?

না ভাই, দাসখত নয়, আমরা শান্তি চাই। এ আমাদের পরিবেশ, এ পরিবেশ যদি না মানেন তাহলে আপনিও শান্তি পাবেন না, আমরাও শান্তি পাব না। আমি আমার পরিবেশের কথা জানালাম, আপনি যদি পছন্দ করেন তাহলে সম্পর্ক হবে, না হলে প্রয়োজন নেই।

একটু চুপ করে থেকে দেলোয়ার উত্তর দিল, আমিও মুসলমানের ছেলে। আমার পূর্বপুরুষ ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। আমি শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাবে ইসলাম থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছি। আমাকে একটা সুযোগ দিন, যাতে আমি প্রমাণ করতে পারি, আমি মুসলমান।

আলহামদু লিল্লাহ! আপনার কথায় আমি খুশি হয়েছি ভাই। আপনাকে আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আপনাকে এখন মেয়ে দেখাব।

না আপা, মেয়ে আমি দেখব না। আপনার কথা শুনেই আমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে।

তারপর খুব সামান্য আয়োজনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর আমার সে ভাইটি আর কোনোদিন নামায কাযা করেনি। দাঁড়ি কামায়নি। ও নাকি আগে ঈদের নামাযও পড়ত না। আর পর্দার ব্যাপারে কোনো শিথিলতা করেনি। এখন তাদের দুই ছেলে। আল্লাহ্র রহমতে বড় সুখী একটা পরিবার!

০০০০০

www.amarboi.org

১০. কিছু সত্য বচন

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ের 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'- এ সতর্কবাণী লিখে দেওয়া হয়। এ লেখায় ধূমপানকারীদের কিছু আসে যায় না। তারা ধূমপান থেকে বিরত থাকে না। সিগারেট কোম্পানিগুলোর লিখতে হয়, তাই লেখে। সরকারের ধরি মাছ না ছুঁই পানি দশা। ঠিক এনজিও'র ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটছে। সরকারের অনুমোদনেই এনজিওরা দেশের মধ্যে কাজ করে। যদিও মাঝে মাঝে সরকার কিছু ব্যাপারে এনজিওদের সতর্ক করে। তা কেমন যেন লোক দেখানো। সরকার যেখানে ওদের কাজ করার অনুমোদন দিয়েছে, সেখানে কয়েকজন নগণ্য মুন্সি মওলবী চিৎকার করে কী করতে পারে? বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি আর সার দিয়ে বড় করে যখন বৃক্ষ ফল দিতে শুরু করল, তার উপর সে ফল যদি হয় সাময়িকভাবে সুস্বাদু, পরবর্তীতে যতই ক্ষতিকর হোক না কেন, সে ফল থেকে সাধারণ জনগণকে নিবৃত্ত করা কঠিন হবে।

সে ফলের অনিষ্ট থেকে জনগণকে বাঁচানোর একটাই রাস্তা- গাছটা গোড়া থেকে কেটে ফেলা। আমাদের মতো লেখক-লেখিকারা যতই লেখালেখি করি না কেন, এতে কিছুই হবে না; যদি সরকার কোনো পদক্ষেপ না নেয়। কিন্তু সরকার কি সে পদক্ষেপ নেবে? আমাদের সরিষার মধ্যে ভূত। যারে দিয়ে ভূত তাঁড়াব তারেই ধরেছে ভূতে। আমাদের দরকার এমন একটা সরকার, যারা ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশ চালাবে। তাহলে দেশ তথাকথিত এনজিওদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

এনজিওগুলো গরীব মানুষদের আর্থিক সচ্ছলতার লোভ দেখায়। দারিদ্র্যের সুযোগে এদের জড়িয়ে ফেলে ঋণের জালে। সে জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার মতো ক্ষমতা অনেকের হয় না। চড়া সুদের জালে ওরা আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়।

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ওদের। ওদের কর্মপদ্ধতি দেখলে মনে হয়, ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস করাই ওদের একমাত্র কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে ওরা বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে–

ক. পরিবারের ভিত ভেঙে দেওয়া।

খ. মেয়েদের বেপর্দায় চলতে উসকে দেওয়া।

গ. মুসলিম জনগণকে ইসলামের প্রতি উদাসীন করে তোলা।

ঘ. স্বামীকে মান্য করে চলতে নিষেধ করা।

www.amarboi.org

ঙ. সমাজের সকল ক্ষেত্রে সুদের প্রচলন ঘটানো।

চ. লোনের কিস্তি দেওয়ার নামে সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা ও অশান্তির মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য করা।

এদের হাত থেকে নিস্কৃতির উপায় একটাই- সরকারকে সচেতন হতে হবে, ইসলামমুখী হতে হবে। আর সরকারকে ইসলামমুখী করতে হলে প্রয়োজন গণ-সচেতনতা। জনগণকে বুঝতে হবে, ৮৯% মুসলমানের দেশে ইসলামবিরোধী এসব কর্মকান্ড কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না।

কাগজে-কলমে দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্যের কথা এনজিওরা যে বলে, তার বাস্তব ফলাফল কোথায়? পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গরীব আরো গরীব হয়েছে। আর্থিক উন্নতির কথা বলে জনগণকে ওরা হয়রানি আর ধোঁকা ছাড়া কিছুই দিতে পারে নি।

সত্যি কথা বলতে কী, ওদের দেখলেই সেই আফ্রিকার রাক্ষুসী ফুলের কথা মনে পড়ে।

'সুন্দর সুবাসিত রূপে ঝলমল
সেই যে আফ্রিকার গহীন বনের ফুল।
নাম জানি না তার
মনোলোভা রূপ মেলে ধরে
ফুটে থাকে বন আলো করে।
বোকা কীট-পতঙ্গগুলোবুঝে না।
সেই মরীচিকায় প্রতারিত হয়।
মধুর আশে ফুলে এসে বসে
ফুলটি থাকে এরই প্রতীক্ষায়
মুহূর্ত বিলম্ব করে না সে ফুল
গ্রাস করে বোকা পতঙ্গকে।
আবার ঝলমলে রূপ নিয়ে
বিকশিত হয় রাক্ষুসী ফুল
রাস্তা পাশে গ্রামে-গঞ্জে
সুদৃশ্য অট্টালিকা,

www.amarboi.org

মনোলোভা কারুকাজ
আশা, দিশা, আশ্রয়
কতনা মনোহারী নাম।
মানুষ নামের পোকা-মাকড়গুলো
ছুটে আসে মধুর লোভে
এই এনজিওগুলো থাকে
এরি প্রতীক্ষায়।
মূহূর্ত বিলম্ব করেনা
গ্রাস করে পোকা-মাকড়গুলোকে
ভেঙে তছনছ হয়ে যায়
পোকা-মাকড়ের সংসার।
ওদের রক্ত চুষে নিয়ে আরো
রূপবতী হয় এনজিওগুলো।"

- আল্লাহ হাফেজ -

θθθθθ

আমাদের প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বইগুলো পড়ুনঃ

১. আমরা কেমন মুসলমান
২. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
৩. তাকওয়া অর্জনই হোক মু'মিন জীবনের বৈশিষ্ট্য

www.amarboi.org

লেখিকার প্রকাশিত কয়েকটি বই

১. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
২. মহিমান্বিত তিনটি রাত
৩. যিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত
৪ দাউস কক্ষোণো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
৫. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১
৬. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২
৭. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
৮. শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর
৯. নামাজ বেহেশতের চাবী
১০. সুনামী
১১. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ তায়ালার জবাব
১২. ভালবাসা পেতে হলে
১৩. কিছু সত্য বচন
১৪. আমরা কেমন মুসলমান?
১৫. তাকওয়া অর্জনই হোক মুমিন জীবনের লক্ষ্য
১৬. ডুবন্ত পুরুষ
১৭. চরমোনাইয়ের পীর আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এসেছে
১৮. বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা
১৯. বিদ'য়াতের বেড়াজালে ইসলাম
২০. মহরমের শিক্ষা
২১. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে
২২. নারী ও পুরুষ পুরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক
২৩. শাফায়াত মিলবে কি?
২৪. স্বস্তির বাতিঘর
২৫. আজ আমার মরতে যে নেই ভয়
২৬. মাসুদা সুলতানা রুমি'র রচনাসমগ্র-১
২৭. মাসুদা সুলতানা রুমি'র রচনাসমগ্র-২

প্রফেরস'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১-১২৮৫৮৬